Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 145–150
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

জাতীয়তাবাদের আলোকে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক

অন্তিমা ভট্টাচার্য
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: antima1990.28@gmail.com

Keyword
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, স্বদেশীকতা, জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ, বৈপ্লবিক চেতনা, গণনাট্য সংঘ, মেলোড্রামা, সার্বজনীন সত্য, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

Abstract
উনবিংশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বাংলায় ঐতিহাসিক বা দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনায় সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল বাঙালির ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবোধের ক্রম-বর্ধমানতা। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে আবির্ভূত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটকগুলির বেশিরভাগ চরিত্র আদর্শ দেশপ্রেমিক চরিত্র রূপে প্রতিভাত হয়েছে। এই সময় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাগুলি নাট্যকারের হৃদয়াবেগকে তীব্র অভিঘাত দ্বারা আন্দোলিত করতে সক্ষম হতে শুরু করে। এককথায় তাঁর হাত ধরে বাংলা নাট্য রচনার ক্ষেত্রে এক পালাবদলের সূচনা ঘটে। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলি সনাতন ভারতবর্ষের জাতীয় বীরত্বপূর্ণ চরিত্রের আদর্শ দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছে। তৎকালীন বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদ এবং স্বদেশ প্রেমের সংমিশ্রণে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সংবেদনশীলতা এবং ভাবময়তার প্রতীক রূপে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে।

Discussion
বাংলা সাহিত্যে মৌলিক ঐতিহাসিক নাটক রচনায় সূত্রপাত ঘটেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্রের নাট্য রচনা এবং নাট্যাভিনয়কে কেন্দ্র করে বাংলায় এক গৌরবময় যুগের সূত্রপাত ঘটেছিল। তবে সেখানে বিদেশি সাহিত্যের কাহিনি এবং সংলাপের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল বিদ্যমান। কারণ বাঙালির ইতিহাস চর্চা সূচনা হয়েছিল ইউরোপীয় শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। উনিশ শতকের বাঙালি জাতি History Of Indian, Annals And Antiquities Of Rajasthan ইত্যাদি গ্রন্থগুলির দ্বারা সবথেকে বেশি প্রভাবিত হতে শুরু করে। তারপর ধীরে ধীরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ সাহিত্যিকদের তত্ত্বাবধানে দেশাত্মবোধ মিশ্রিত ঐতিহাসিক বাংলা নাটক রচনা ব্যাপকভাবে প্রসারতা লাভ করে। এই যুগে যখন বাংলায় নাটক নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল

ঠিক তেমনি সময় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা নাটক রচনায় ব্রতী হন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পর বাংলা সাহিত্যে যে ঐতিহাসিক নাট্যকারের নাম সর্বপ্রথম উঠে আসে তিনি হলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রোত্তর যুগে আবির্ভূত নাট্যকার হিসেবে তাঁর রচিত নাটকগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্বদেশীকতা ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রকাশময়তা। এ সম্পর্কে অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন,

> *"আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যখন জাতীয় চেতনা ও গৌরববোধ প্রতিদিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তখন এই ঐতিহাসিক নাটকগুলি জনগণের চিত্তে গভীর আবেদন জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এই আবেদনময়তার জন্যই অনেক নাটক কলা ও রীতির দিক দিয়া ত্রুটিপূর্ণ হইলেও রঙ্গালয়ে সমাদর লাভ করিয়াছে। অনেক নাটকেই অকারণ ভাবাবেগ এবং অহেতুক উৎস সঞ্চয় করিয়া লেখকগণ দর্শকদের স্বদেশী ভাবানুপ্রাণিত চিত্তকে অভিভূত করিতে সচেষ্ট করিয়াছিলেন।"* [১]

তাঁর নাটকগুলির মধ্যে বহু স্থানে কাহিনির বর্ণনা এবং চরিত্রের নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর রচিত নাটকগুলিতে তিনি সনাতন ভারতবর্ষের সমাজবদ্ধ সাধারণ মানুষের অতীতের আশ্রয়মূলক তথ্যনিষ্ঠ জীবনচর্যার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং ভাবময়তার বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানান তথ্যগুলিকে সাহিত্যের মত একটি ধারার সার্বজনীন সত্য হিসাবে তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রবীন্দ্র-উত্তর যুগে তিনিই আধুনিক রঙ্গালয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রযুক্তিগত পদ্ধতিকে সর্বপ্রথম বাংলা নাটকে প্রযুক্ত করেন। চরিত্র অঙ্কন, সংলাপ রচনা, নাট্যদ্বন্দ্ব সৃজন ও নাটকীয় আবেগ সংগঠনে তিনি তাঁর নাটকগুলিতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত নাটকগুলি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশবাসীর হৃদয়ে গৌরবময় দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। বিশ শতকের ৩০ থেকে ৬০ এর দশক পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর ব্যাপী তিনি যে সকল নাটকগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি বাংলা নাটকের সনাতন রীতির পালাবদলের মাইলস্টোন স্বরূপ বিবেচিত হয়। নাট্যকার হিসেবে স্বমহিমায় তিনি সেই সময়ে বিশেষ খ্যাতির শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক নাটকগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল আবেগঘন দেশাত্মবোধের প্রাসঙ্গিকতা। ইতিহাসগত সচেতনতা, কাহিনির বন্ধনগত দৃঢ়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট ঋদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন,

> *"পৃথিবীতে অল্প সংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাহাদের সুখ-দুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ। রাজ্যের উত্থান-পতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা, যে সমুদ্র গর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। সাহিত্যের পটভূমির মধ্যে এই বিশালতাকে প্রবাহিত করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেই ঐতিহাসিক সাহিত্যের সৃষ্টি।"* [২]

সর্বোপরি তাঁর নাটকগুলির মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মের মানুষদের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংগতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর রচিত নাটকগুলি সেই সময়ে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট বিপ্লব সৃষ্টি করতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে অনেক সমালোচক তাঁর নাটকের চরিত্রগুলিকে জটিল ও বিরুদ্ধ ভাবময় বলে উল্লেখিত করেছেন। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে ঘটনার উপযোগী চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে মৌলিকতা এবং বিশিষ্টতা তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা তাঁকে সুদক্ষ নাট্যকার রূপে চির-স্মরণীয় করে রাখবে।

তিনি অধ্যাপনা দ্বারা কর্মজীবনে প্রবেশ করলেও বেশ কিছুদিন পর সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হন। তৎকালীন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী পরিস্থিতি তাঁকে এই কাজ করতে অধিকতর উৎসাহিত করেছিল। ধীরে ধীরে তিনি কৃষক ও ভারত নামক দৈনিক পত্রিকা দুটির সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। তার কয়েক বছর পর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত হিতবাদী ও বিজলি পত্রিকা দুটি পরিচালনার দায়িত্ব তিনি লাভ করেন। কর্মসূত্রে তিনি রাশিয়া, পোল্যান্ড, নরওয়ে, চীন, সিংহল ইত্যাদি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন, সংগ্রহ করেছেন বহু আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা। তৎকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাসে বিখ্যাত বহু মানুষের সাথে তাঁর আলাপচারিতা ছিল। তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই নাটকগুলির কাহিনি এবং অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল- গৈরিক পতাকা(১৯৩০), দেশের দাবি (১৯৩৪), রাষ্ট্রবিপ্লব (১৯৪৪), সিরাজউদ্দৌলা (১৯৩৮), ধাত্রীপান্না (১৯৪৮), সবার উপরে মানুষ সত্য (১৯৫৭), আর্তনাদ ও জয়নাদ (১৯৬১) ইত্যাদি। এছাড়াও রক্তকমল (১৯২৯), ঝড়ের রাতে (১৯৩১), নার্সিংহোম (১৯৩৩), স্বামী-স্ত্রী (১৯৩৭), তটিনীর

বিচার (১৯৩৯), মাটির মায়া (১৯৪০), মাটির মায়া (১৯৪৩), কাঁটা ও কমল (১৯৪৮), প্রলয় (১৯৫০), জননী (১৯৫৩) প্রভৃতি সামাজিক নাটকও তিনি রচনা করেছেন।

তার রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে তার দেশপ্রেমের সুতীব্র আবেগ এবং অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। তৎকালীন দেশ ও কালের আদর্শ ও মূল্যবোধকে নবভাবে তাঁর নাটকগুলির মধ্যে তিনি প্রকাশিত করেছেন। বিশেষ করে ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁর হাত ধরে আবহমান অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে তথ্য এবং জ্ঞানের সংমিশ্রণ দ্বারা সর্বজনগ্রাহ্য নাটক রচনা সম্ভবপর হয়েছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়েছিল ইংরেজদের তথা ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রসারতার প্রভাবে। এই বিষয়ে বলা যায়,

> *"All values are human creations. Truth is such a value and it has to be created by the human narrator. All values are human creations. Truth is such a value and it has to be created by the human narrative or recounter. In the telling of the story as visualized by him, he discovers the truth. Thus the writer of historical literature like his potential reader, recreates history using the unusual mood. Only a historical incident can help to complete the incompleteness of historical apprehended thoughts and facts."* [৩]

মানব জীবনের জটিল এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলিকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

তৎকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখ-দারিদ্র-অসহায়তা ইত্যাদির নানা দিকগুলিকে ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি অসাধারণ উদ্দীপনা দ্বারা তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে উত্থাপিত করেছেন। তিনি যে সকল নাটক রচনা করেছেন তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তৎকালীন সমাজনীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা উল্লেখিত হয়েছে। তৎকালীন সমাজ এবং রাজনীতির বহু অনাচার-অবিচার-ভ্রষ্টতা-বিপথগামীতা তাঁর মনে বহু অজানা প্রশ্ন তৈরি করেছিল। এই সময়কার অস্থিরতার বিষয়ে মন্মথ রায় বলেছেন,

> *"বিশ এবং ত্রিশের দশকের নাটক কেবল সমস্যার বাহ্যিক রূপচিত্র। কোন রাষ্ট্র-সামাজিক অবস্থার গর্ভে সমস্যার ভ্রূণ জন্মায়, কিভাবে তা সমাজের বুকে পাষাণের বোঝা রূপ হয়ে ওঠে - বিবর্তনের সেই গতিরেখা এ যুগের নাটকে কম-বেশি চিত্রিত হয়েছে। ইংরেজ সরকারের পৈশাচিক পীড়ন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ছিন্নমূল মানুষের স্রোত বাঙালির জীবনে এমন দ্রুত আছড়ে পড়েছিল যে তার আঘাতে সমস্ত বাঙালি জাতি হতচকিত এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনের সাথে এক ভগ্নপ্রায় অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যার আধিক্য, বাণিজ্য-শিল্পের ঘাটতি কৃষির উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। সেই সময় বেকারত্ব ও সীমাহীন সমস্যা বাঙালির জীবনকে জর্জরিত করে তুলেছিল।"* [৪]

বলা যেতে পারে,সেই জীবন-জিজ্ঞাসা থেকেই তিনি জটিলতামুক্ত এক আলোকময় পথের সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন তাঁর এই নাট্য রচনার মাধ্যমেই। সেই সময়ের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ভারতবর্ষের মানুষদের সীমাহীন অত্যাচার-অনাচার থেকে মুক্তির সন্ধান দিতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তিনি কেবলমাত্র নাট্যকার ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষদের বৈপ্লবিক চেতনা এবং সমাজ ভাবনা উদ্দীপনকারী এক মহান সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব।

তাঁর সময়ে রচিত অন্যান্য দর্শক মনোরঞ্জনকারী নাটকগুলির নাচ-গান- রঙ্গরসিকতার দিকটির বিপরীতে গিয়ে তিনি এক অদ্ভুত রসময়তার সন্ধানের উদ্দেশ্যে দর্শকদের অনুসন্ধানী করে তুলেছিলেন। বলা যায় প্রথমদিকে থিয়েটারের প্রতি উৎসাহের থেকেই তাঁর নাট্যকার হয়ে ওঠার স্বপ্নটি গড়ে উঠেছিল। তাঁর রচিত নাটকগুলি আঙ্গিকের দিক থেকেই কেবলমাত্র মৌলিক ছিল তা নয়, নাটকের কাহিনি এবং চরিত্রের অসাধারণ মেলবন্ধন সৃষ্টিতেও তিনি সফল হয়েছিলেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে রক্তকমল নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই তিনি নাট্যকার হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেন। বাংলা নাটকের মধ্যে তিনি প্রথম নাট্যকার যিনি অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে ইউরোপীয় নাট্য প্রযোজনার নানা টেকনিক তাঁর নাটকগুলি মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে সফলতার সাথে ব্যবহার করেছিলেন। আসলে স্বাধীনতার পূর্বে তিনি যে সকল নাটক রচনা করেছেন তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। বিশেষ করে তাঁর ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক নাটকগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের সনাতন ইতিহাসের অমর চরিত্রগুলি আকর্ষণীয়ভাবে উত্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে এই

ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে তিনি যেভাবে সাহিত্য সুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহাসিক সত্য এবং ঐতিহাসিক তথ্যগুলি অবতারণা করেছেন- তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তিনি যে সকল নাটক রচনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে নাট্যকারের নৈতিকতা এবং আদর্শবোধের এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ে তিনি কেবলমাত্র নাট্যকার হিসেবে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, এই সময়ে তিনি অন্যতম প্রধান একজন নাট্যকর্মী হিসাবে নিজেকে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের সাথে সংযুক্ত করেন। বামপন্থী আদর্শে নির্মিত আই.পি.টি.- এর সাথে এই সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েন। প্রথমদিকে রচিত ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক নাটকগুলির মধ্যে বামপন্থা অধিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে হাজির না হলেও বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তৎকালীন গণনাট্য সংঘের আন্দোলন তাঁর হৃদয়কে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই সময় থেকে তার নাটকগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট মনোভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়তে থাকে। সে কারণেই সাধারণ মানুষের অত্যাচার-বঞ্চনা-সুখ-দুঃখ-ব্যর্থতা-বেদনাবোধ প্রতিবাদের আকারে তাঁর নাটকগুলির মধ্যে বিচিত্র আকারে চিত্রিত হয়েছে। তাই পরাধীন ভারতবাসীর নৈরাজ্যের হতাশা ও গ্লানি কাটিয়ে মানব জীবনের অবক্ষয়ের ইতিকথা দ্বিধান্বিত ভাবেই তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, শত যন্ত্রণার শেষে প্রীতি এবং মৈত্রীর পথেই জনমানুষের যথার্থ মুক্তি সংঘটিত হবে।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত আধুনিক নাটকগুলির মধ্যে বিষয়গত বিন্যাস এবং বিভিন্নতা সেই সময়কার অন্যান্য নাট্যকারদের থেকে তাঁকে স্বতন্ত্র একটি স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। তাঁর রচিত আধুনিক নাটকের মধ্যে বিষয় ভাবনার অভিনবত্ব বিভিন্নভাবে উত্থাপিত হয়েছে। মূলত ইতিহাসকে কেন্দ্র করে তিনি নাটক রচনায় প্রয়াসী হলেও নাটকগুলির বিষয়ের বিচিত্রতা বাংলা সাহিত্যে তাঁকে বিশিষ্ট একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিতে সক্ষম হয়েছে। গৈরিক পতাকা নাটকটির মধ্যে ছত্রপতি শিবাজী চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পরাধীন ভারতের জাতীয়তাভাবের এক আবেগময় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেই যুগে একই সাথে কোহিনুর এবং মিনার্ভা এই দুটি রঙ্গমঞ্চে প্রায় আড়াই মাস ধরে একটানা এই নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। ছত্রপতি শিবাজীর ত্যাগ এবং শক্তির প্রকাশ- তৎকালীন মারাঠি সমাজকে স্বাধীনতার স্বপ্ন এবং আশার আলো দেখিয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন এবং শোষণের মাঝে এক অদম্য আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে কিভাবে স্বাধীন জাতি তথা স্বাধীন দেশ তৈরি করা যায় তার কাহিনি এই নাটকের মধ্যে বিচিত্রভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

সিরাজউদ্দৌলা নাটকটি তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক বলে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় নবাবী আমলের সমাপ্তি ঘটে, শুরু হয় ইংরেজদের অত্যাচারময়-নির্মম শাসনকাল। এই নাটকটির মধ্যে তৎকালীন বাঙালি জাতির স্বতঃস্ফূর্ত বেদনাময় হৃদয়ের করুণ অভিব্যক্তির আবেদন উত্থাপিত হয়েছে। রাষ্ট্রবিপ্লব নাটকটির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান নাটকের প্রভাব থাকলেও নাটকের মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক প্রসঙ্গ বর্তমান। এই নাটকটির মধ্যে মূলত শাহজাহানের সিংহাসন ত্যাগের পরবর্তী মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকারগত যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল তারই বর্ণনা করা হয়েছে। সম্রাট দারার সর্বধর্মসমন্বয়মূলক মানসিকতা এবং ঔরঙ্গজেবের ইসলাম ধর্মের প্রতি অন্ধ আকর্ষণময়তা - এই দুইয়ের দ্বন্দ্বময়তার এক চমকপ্রদ চিত্র এই নাটকে ফুটে উঠেছে। আবার ধাত্রীপান্না নাটকটিতে বনবীরের বীরত্ব এবং মাতৃভক্তি প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়েছে। নাটকটির ঘটনাগত পরম্পরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঘাত-প্রতিঘাতের সমন্বয়ে অঙ্কিত হয়েছে। দুটি বিপরীত ধরনের ভাবের সংঘর্ষে এই নাটকটির নাট্যরস কোনও কোনও স্থানে অধিক আবেগময়তা লাভ করেছে। তার ফলে এই নাটকটি অনেকটা মেলোড্রামা বা অতিনাটকীয়তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

উনবিংশ শতকে সৌখিন থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা নাট্যচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল। তারপর ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত নাটক রচনার শাখাটি পরিপূর্ণতা লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক নাট্যকারের নাট্য রচনার আঙ্গিক পৃথক পৃথক ধরনের হয়ে থাকে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে নাট্য রচনার আঙ্গিকগত বিচিত্র দিককে উত্থাপিত করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম চলাকালীন

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কলম ধরেছিলেন এই বিখ্যাত নাট্যকার। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক নাটকগুলির মধ্যে ইতিহাস ও তথ্য যুগ্মভাবে অবস্থান লাভ করেছে। বিভিন্ন কাল্পনিক-অপ্রধান চরিত্র এবং ঘটনার সমাবেশ দ্বারা তিনি চরম নাটকীয় উৎকর্ষতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে। তাই ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক চরিত্রগুলির মনুষ্যত্ব এবং বীরত্ব- এই দুই বিপরীত দিকের সেতুবন্ধন করে তিনি নাটকের চরিত্রগুলিকে অনন্যতা দান করেছেন।

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ রচিত নাটকগুলির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল চরিত্রগুলির বীরত্ব ও আকর্ষণময় সংলাপ। তার নাটকের সংলাপ রচনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, যা নাটকীয় দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতকে তীব্র থেকে তীব্রতর মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। এছাড়াও তাঁর সৃষ্ট নাটকের চরিত্রগুলির জটিল ও বৈপরীত্যময় অবস্থান নাটকের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাঁর রচিত নাটকগুলিতে ব্যক্তি নায়কতন্ত্র প্রধান স্থান অধিকার করেছে। তৎকালীন নাট্যরচনার ধারা, রঙ্গমঞ্চ, দর্শকদের রুচি ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেই সময়ের দেশ-কাল ইত্যাদির পটভূমি তাঁর সাহিত্যে বহুমাত্রিকতা সৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁর রচিত নাটকগুলিতে দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, আবহসংগীত - ইত্যাদির যথাযথ ও সার্থক প্রয়োগ দ্বারা তাঁর জীবনের আদর্শময়তাকে সুদক্ষভাবে প্রতিস্থাপিত করেছে। যদিও তাঁর রচিত নাটকগুলিতে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক সমস্যার নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, তবু একথা বলতেই হয় যে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের নিবিড় ও গভীর জীবনবোধ তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাঁর নাটকের বর্ণিত চরিত্রগুলির জীবনের কামনা-বাসনা-আনন্দ-দুঃখ- জটিলতা ইত্যাদি দিকগুলিকে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বর্ণনা করেছেন। যদিও এতে কখনো কখনো নাটকগুলির মধ্যে অতিশয় পরিস্থিতির অসমতা আত্মপ্রকাশ করেছে, তবুও চরিত্রগুলির গৌরবময় বিজয় লাভের ঘটনা নাটকের সমস্ত সস্তা মনোরঞ্জনমূলক দিকগুলিকে দূরীভূত করতে পেরেছে। আবার অন্যদিকে নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের অধিক প্রখরতা এবং দীপ্তির কাছে অপ্রধান চরিত্রগুলির দূর্বলতা অনেক সময় অনুপযুক্ত এবং অর্থহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে নাটকগুলির নাট্য দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে এবং দৃশ্য সংস্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। তবে কোনও কোনও ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রতিশোধমূলক মনোভাব এবং নির্মমতা নাটকগুলির মধ্যে মনোরম পরিবেশ সৃষ্টিতে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনন্য ও বৈচিত্র্যময় আঙ্গিককে গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস চেতনা এবং তথ্য বর্ণনা করবার যে কৌশলগত দক্ষতা নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন - সেই উভয় দিকেরই সমন্বয় তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে ঘটিয়েছেন। তৎকালীন সময়ের পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষদের হৃদয়ের গ্লানিকে ঘুচিয়ে তার স্থানে স্বাধীন দেশের আদর্শবোধকে তিনি তাঁর নাটকগুলির মধ্য দিয়ে নির্মাণ করেছেন। বাঙালি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ জাতি। আর সে কারণেই বিশ শতকে পরাধীন বাঙালি জাতির হৃদয়ের বন্ধনহীন স্বাধীনতার নব অরুণের জ্যোতিকে তিনি আলোকোজ্জ্বল করে বিচ্ছুরিত করেছেন। এ সম্বন্ধে সৌমিত্র বসু তাঁর বাংলা ঐতিহাসিক নাটক প্রবন্ধে বলেছেন,

> *"আধুনিক নাটককারদের ইতিহাস বিমুখতার একটি বড় কারণ লুকিয়ে আছে সমকালীন নাট্যধারার মধ্যে। স্বাস্থ্যে, কণ্ঠস্বরে বা অভিনয়রীতিতে ইতিহাসের মহনীয়তাকে প্রকাশ করবার যোগ্যতা অধিকাংশ নাট্যকর্মীর নেই, তার উপর ইদানিং যে ধরনের পারিবারিক নাট্যকাঠামোয় আমাদের দায়বদ্ধতা, সেখানে তো ইতিহাসের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ। আশা করা যায়, এই অবস্থা একদিন না একদিন কাটবে, বিশেষ স্থান-কাল-শ্রেণি দিয়ে ঘিরে রাখতে চাওয়া বাংলা নাট্যে অসীম দরিয়ায় ঢেউ বইয়ে দেবেন নবীন প্রজন্মের নাট্যজনেরা।"* [৫]

পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করবার জন্য বাঙ্গালিদের যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার, তার প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন নতুন ধরনের এক নৈতিকতার। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক নাটক রচনা এবং অভিনয়ের ধারাটি বর্তমান সময়ে বেশ কিছুটা গৌণ হয়ে পড়েছে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ধর্মীয় বিদ্বেষ দূরীভূত করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করবার সমর্থনেই তাঁর নাটকের চরিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছে। বাঙালি জাতির জাতিগত

বিদ্বেষ দূর করে একমাত্র যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-ত্যাগ-প্রেম ইত্যাদির মাধ্যমেই আত্মনির্ভরতাসম্পন্ন আদর্শ দেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এই বাণী তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির রন্ধে রন্ধে সঞ্জীবিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ, অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৩৩৫
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৯
৩. Paniker, Ayyappa, Truth, History and Fiction: A Comparative Study of Bankim Chandra Chatterjee And C.V.Raman-Pillai, Jadavpur University Journal of Comparative Literature, 1989-90, p. 37
৪. রায়, মন্মথ, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা, গ্রন্থম্ প্রকাশনী, ১৯৬৫, পৃ. ১৩
৫. বসু, সৌমিত্র, বাংলা ঐতিহাসিক নাটক, রত্নাবলী, প্রথম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৩, কলকাতা, সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পা.) পৃ. ৫৪২